সাহিত্যে ছোটগল্প ও বাংলা গল্প-বিচিত্রা

সাহিত্যে ছোটগল্প ও বাংলা গল্প-বিচিত্রা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

কবি

সাহিত্যে ছোটগল্প ও বাংলা গল্প-বিচিত্রা
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৮

প্রকাশক
কবি প্রকাশনী
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রিন্টার্স
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান পাবলিশার্স
১০/২ এ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট কলকাতা

মূল্য: ৪৫০ টাকা

Sahitye Chotogalpa O Bangla Galpa-Bichitra by Narayan Gangopadhaya
Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market Kantabon Dhaka 1205 First Edition: February 2018 Cell: +88-01717217335 Phone: 02-9668736
Price: 450 Taka RS: 400 US 20 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-93397-2-4

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

গল্পগুরু মহাকবি রবীন্দ্রনাথকে
দীন প্রণাম

ও

আচার্য ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত
পরমশ্রদ্ধাস্পদেষু

..... সূ চি প ত্র .....

সাহিত্যে ছোটগল্প

(প্রথম খণ্ড : উৎসকথা)

সূচনা : প্রথম নায়ক সূর্য ১৩
গল্পে উৎসভূমি : ভারতবর্ষ ২৬
আলিফ্ লায়লা ওয়া লায়লা : পারস্য উপন্যাস ৭০
ইয়োরোপ : অরোরার আলো ৮৭
তিন চূড়া : বোক্কাচ্চো, চসার ও রাব্‌ল্যা ১০৯
ঊনবিংশ শতাব্দী : আধুনিক ছোটগল্পের আবির্ভাব ১২৮

(দ্বিতীয় খণ্ড : রূপতত্ত্ব)

ছোটগল্পের সংজ্ঞা ২০৩
উপাখ্যান : বৃত্তান্ত : ছোটগল্প ২৩০
গল্প : রূপে রূপে ২৪৩
একটি ছোটগল্প : বিশ্লেষণ ২৫৯
শেষ কথা ২৬৪

বাংলা গল্প-বিচিত্রা

প্রথম প্রসঙ্গ
[ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়] ২৭৩
দ্বিতীয় প্রসঙ্গ
[প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়] ২৮৭
তৃতীয় প্রসঙ্গ
[পরশুরাম] ২৯৭
চতুর্থ প্রসঙ্গ
[প্রেমেন্দ্র মিত্র] ৩০৮
পঞ্চম প্রসঙ্গ
[তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়] ৩২৬
ষষ্ঠ প্রসঙ্গ
[মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়] ৩৪২
সপ্তম প্রসঙ্গ
[বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়] ৩৬৪

সাহিত্যে ছোটগল্প

ভূমিকা

কিছুকাল পূর্বে 'সাহিত্যে ছোটগল্প' নামে একটি ক্ষীণকায় গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলাম। বর্তমান বইটি নামতঃ তার দ্বিতীয় সংস্করণ হলেও সম্পূর্ণ নতুনভাবে রচিত হয়েছে। আয়তনে এটি পূর্ববর্তী বইখানির প্রায় তিনগুণ, তার শেষ অধ্যায়টিও অপ্রাসঙ্গিক বোধে এতে বর্জন করেছি।

সাহিত্যের সর্বকনিষ্ঠ সন্তান ছোটগল্প রূপ এবং রীতির দিক থেকে আজ একটি বিশিষ্ট মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই ছোটগল্প সম্পর্কে সাহিত্য-পাঠকের কৌতূহলের অন্ত নেই। সেই কৌতূহলের প্রেরণাতেই বইখানি লিখবার চেষ্টা করেছি। ফ্রান্সে এবং আমেরিকায় ছোটগল্পের উপর অনেকগুলি মূল্যবান গ্রন্থই রচিত হয়েছে কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে সেগুলি প্রায় অলভ্য। সেটিও আমার এই দুঃসাহসের অন্যতম কারণ।

এই বই লিখবার সময় আমাকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিজের পথ কেটে অগ্রসর হতে হয়েছে। এই পরিকল্পনার জন্যও বিশেষ কোনো সহায়তা কোথাও পাইনি। প্রয়োজনীয় কতকগুলি পরিভাষাও আমাকে তৈরি করতে হয়েছে, যেমন Impression কে করেছি 'প্রতীতি', Anecdote কে বলেছি 'বৃত্তান্ত'। এদের যথার্থতা সুধীরাই বিচার করবেন।

ভারতীয় গল্পসাহিত্যে এবং আরব্য উপন্যাসের উপর কিছু বিস্তৃত আলোচনা করেছি, কারণ ইউরোপীয় কথাসাহিত্যের বিকাশে এদের দান সর্বজনস্বীকৃত। 'আর্য জাতির সর্বপ্রাচীন গল্পসংগ্রহ' জাতক থেকেই যাত্রা আরম্ভ করেছি, তারপর পঞ্চতন্ত্রের গতিপথ অনুসরণে, আরব্য উপন্যাসের সহযাত্রী হয়ে ইয়োরোপে পৌঁছেছি। বোক্কাচ্চো, চসার এবং রাব্‌ল্যা—এই মহান ত্রয়ীর সঙ্গে পরিচিত হয়ে উনিশ শতকে আধুনিক ছোটগল্পে প্রবেশ করেছি।

ছোটগল্প-সাহিত্যের প্রেরণা, তত্ত্ব ও রূপ-বৈচিত্র্যই বইটিতে বিশেষভাবে আলোচ্য। উনিশ শতকের শেষাংশে ছোটগল্পের পূর্ণবিকাশ পর্যন্ত যে নির্বাচিত ইতিহাস এতে দেওয়া হয়েছে, তা সেই আলোচনাকে সুস্পষ্ট করে তোলবার প্রয়োজনেই। আশা করি, এখানিকে কেউ একান্তভাবে ছোটগল্পের ইতিহাস বলেই গ্রহণ করবেন না।

ছোটগল্প সম্পর্কে লভ্য বইগুলিতে সামান্য যা কিছু আলোচনা পাই, তাতে মন তৃপ্ত হয় না। ইংরেজ সমালোচক তাঁর নিজের দেশের অনেক স্বল্পশক্তি লেখককে প্রাধান্য দিয়েছেন—মার্কিন সমালোচকও প্রধানত স্বদেশের সীমাতেই পরিতৃপ্ত থাকতে চান; আমরা ভারতীয় বলেই আমাদের মনের দ্বার মুক্ত—পরমানন্দেই সকলকে শ্রদ্ধা ও স্বীকৃতি জানাতে পেরেছি। সেই কারণেই অনুমান

করি, সংক্ষিপ্ত হলেও ছোটগল্পের উপর ঠিক এই ধরনের আলোচনা বোধ হয় ইতোপূর্বে বিশেষ হয়নি।

ডলার নিয়ন্ত্রণের ফলে বিদেশি বই সংগ্রহ করা বর্তমানে প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবু যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি এবং এর জন্য যে পরিশ্রমটুকু করতে হয়েছে, তা আমার আনন্দের শ্রম। সেই আনন্দের অংশ যদি পাঠকদের কাছে কিছু পরিমাণেও নিবেদন করতে পেরে থাকি, তা হলেই আমি কৃতার্থ।

অনেকগুলি উপাদেয় এবং শ্রেষ্ঠ গল্পের সংক্ষিপ্ত রূপ মধ্যে মধ্যে পরিবেষণ করতে হয়েছে। আলোচিত গল্পগুলিকে সম্পূর্ণভাবে দেওয়া কোনোমতেই সম্ভবপর ছিল না—সেদিক থেকে খানিকটা নিরুপায় ক্ষোভ রয়েই গেল। মূল গল্পগুলির সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরা সহজেই এই অভাবটুকু পূরণ করে নেবেন এবং যাঁরা সেগুলি পড়েননি, ভরসা করি, এ থেকে তাঁদের কৌতূহল জাগ্রত হবে।

যে বিরাট কাজে হাত দিয়েছিলাম, তার দায়িত্ব খুব সামান্যই হয়তো পালন করতে পেরেছি। কিন্তু ভবিষ্যতে যোগ্য ব্যক্তিরা হস্তক্ষেপ করে আমার এই সূচনার প্রয়াসকে সম্পূর্ণতার দিকে নিয়ে যাবেন এই আশাই রাখি।

আমার পরম শ্রদ্ধেয় আচার্য ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত বইখানি রচনায় সর্বাধিক প্রেরণা দিয়েছেন; আমার প্রতি তাঁর নিত্য উচ্ছলিত স্নেহ কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অপেক্ষা রাখে না। অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ রায়, অধ্যাপক জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী ও কবি-সাংবাদিক সরোজকুমার দত্ত প্রমুখ বন্ধুরা আমাকে নানাভাবে সহায়তা ও উৎসাহিত করেছেন। চিরসুহৃৎ অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েকখানি মূল্যবান গ্রন্থ দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন, বন্ধুবর অধ্যাপক ডক্টর শীতাংশু মৈত্র কয়েকটি ফরাসী উচ্চারণের উপর আলোকপাত করেছেন। অগ্রজপ্রতিম অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্যের সঙ্গে আলোচনাতেও আমি উপকৃত হয়েছি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-এর শ্রীযুক্ত সনৎকুমার গুপ্ত প্রমুখ কর্মীরাও নানাভাবে সহযোগিতা দিয়ে আমাকে বাধিত করেছেন। ডি. এম. লাইব্রেরির শ্রীযুক্ত গোপালদাস মজুমদার ও শ্রীযুক্ত অমূল্যগোপাল মজুমদার আমাকে অনেক দুর্মূল্য ও দুর্লভ গ্রন্থ সংগ্রহ করে দিয়েছেন—তাঁরা সাহায্য না করলে বইখানি লেখাই সম্ভব হতো না। তাঁদের অকুণ্ঠিত প্রীতি ও নিত্য-হিতৈষণাকে এই প্রসঙ্গে সানন্দে স্মরণ করি।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

কলিকাতা
১৫ই ফাল্গুন, ১৩৬৫

এক

সূচনা : প্রথম নায়ক পর্ব

গল্পের জন্ম হলো কবে?

প্রশ্নটির একমাত্র জবাব আছে। মানুষের ইতিহাস যেদিন থেকে আরম্ভ, গল্পের জন্মও সেদিন থেকেই। বিবর্তনের অনেকগুলি পর্ব পার হয়ে প্রস্তর যুগের পাহাড়ের কালো গুহার ভিতর বড় বড় কাঠের কুঁদো জ্বালিয়ে আমাদের শিকারজীবী পিতৃপুরুষেরা গোল হয়ে বসেছে একসঙ্গে; আগুনের রক্তাভ আলোয় শৈল-প্রাকারে তাদেরই আঁকা হরিণ ও বাইসন শিকারের বিচিত্র চিত্রকলা রচনা করেছে অপরূপ পরিবেশ। বাইরে ফার্ণজাতীয় দীর্ঘ তরুণ ঘন অরণ্যে ঝড়ের হাওয়া মাতামাতি করছে আর বনের কলরোলকে ছাপিয়ে ভেসে আসছে ক্ষুধাতুর নরখাদক হিংস্র জন্তুর গর্জন। সেই সময় ভিতরের ঘনীভূত নিরাপত্তার মধ্যে কথাকুশল প্রাজ্ঞেরা গল্প বলে চলেছে।

কিসের গল্প? প্রকৃতির নানা বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে মানুষের সংগ্রাম এবং জয়লাভ; নিষ্ঠুর ও জান্তব প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছ থেকে আত্মরক্ষার উপায় এবং উপকরণ; সাহস ও বুদ্ধির সহযোগিতায় অন্যান্য বিরোধীগোষ্ঠীর উপর প্রভুত্ব বিস্তারের কাহিনী। উদ্দেশ্য দ্বিবিধ। প্রথমত তরুণদের শিক্ষা দান—জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞ করে তোলবার মূল্যবান উপদেশ, দ্বিতীয়ত আনন্দের পরিবেষণ। জ্ঞানাঞ্জন-প্রলেপন এবং চিত্ত-বিনোদন, এই দ্বৈত প্রেরণা থেকেই গল্পের আবির্ভাব।

পৃথিবীর প্রাচীনতম কাহিনীগুলি আজ অবলুপ্ত। আফ্রিকার সবচেয়ে দুর্গম বনভূমি অথবা অ্যামাজনের সবচেয়ে দুষ্প্রবেশ বনাঞ্চল—যার এক দশমাংশেও আজ পর্যন্ত সভ্য মানুষের পদক্ষেপ ঘটেনি, সেই সব তমসাচ্ছন্ন নিভৃত প্রান্তেও মানুষের কালগত স্বাভাবিক বিবর্তন পরিবর্তন ঘটেছে। প্রাচীনতম মানবের শিলীভূত কঙ্কালগুলির মতো, আদিম তরুর অতলবাসী অঙ্গার রূপের মতো, আদি গল্পেরাও মৃদ্বিবরে আশ্রিত হয়েছে, তাদের খনন করে তোলবার বিদ্যা কোনো ভূ-তাত্ত্বিকেরই জানা নেই। তবু প্রাথমিক মানুষের মনন আজও 'তথাকথিত' অসভ্যদের মধ্যেই কিছু পরিমাণে অবিকৃত রূপে পাওয়া যাবে—আফ্রিকার জঙ্গলের অতিকায় বাওবারের মতো তারা অনেকেই দীর্ঘকাল ধরে মাটির গভীরে শিকড় মেলে বসে আছে।

মানববিজ্ঞানী বলেন, পৃথিবীতে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষ—আর্য, মোঙ্গল,

সেমিটিক কিংবা নিগ্রয়েড—পরস্পর-সাপেক্ষতা না রেখেই বহুদিন ধরে স্বয়ংসিদ্ধরূপে বিকশিত হয়েছে। বৈজ্ঞানিকের তথ্যপঞ্জীকে অবিশ্বাস করবার উপায় নেই। তবু জগতের বিভিন্ন দেশে প্রচলিত নিজস্ব গল্পকথার মধ্যে যদি তুলনামূলক আলোচনা করা যায়, তাহলে চোখে পড়বে, চিন্তায় কল্পনায় ও গল্পগঠনে তাদের মধ্যে কী আশ্চর্য মিল, কী অবিশ্বাস্য সহযোগ।

আমরা বলেছি, শিক্ষা ও আনন্দ—এই যুক্তবেণীতেই মানুষের গল্পরচনা আরম্ভ। নীতিগল্পের জন্যে সে প্রধানত আশ্রয় করেছে জীবজন্তুর রূপককে; আর আনন্দের প্রয়োজনে এসেছে রাক্ষস-খোক্কস, অত্যাচারী রাজা, বন্য হিংস্র জন্তু অথবা জিঘাংসু সরীসৃপের শত্রুতা, শঠতা ও প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে সুখ-সৌভাগ্য লাভের কাহিনী। এই দুটি মৌলিক উপকরণের জন্য আফ্রিকার গল্পকথার দিকেই তাকানো যাক। এদের মধ্য থেকে অনেকগুলি কৌতূহলজনক জিনিস আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

আফ্রিকার বিশাল মরুভূমিতে ছিল একটি পুকুর—নির্মল স্বচ্ছ তার জল। কিন্তু স্বয়ং রাজাধিরাজ হাতি ছাড়া সে আর কারোই পান করবার আদেশ দিল না।

একদিন একটি খরগোস পিপাসায় কাতর হয়ে সেই জল খেয়ে ফেলল, কিন্তু পুকুরের চালাক খরগোসের কাদায় পায়ের দাগ পড়েছে, সুতরাং সে ধরা পড়বেই। তাই বুদ্ধি করে, অদূরেই গভীর ঘুমে মগ্ন একটি জারবোয়া ইঁদুরের পায়ে আর মুখে কাদা মাখিয়ে দিয়ে পালিয়ে গেল সে।

চালাক খরগোসের গল্প[১]

যথাসময়ে রাজা হাতি জল চুরির ঘটনা জানতে পারল। আর তৎক্ষণাৎ নির্দোষ জারবোয়া ইঁদুরের হলো প্রাণদণ্ড। অবশ্য সত্যটা বেশি দিন চাপা রইল না—মনের আনন্দে নিজেই একদিন খরগোস তা প্রকাশ করে ফেলল। জন্তুরা যখন তাকে আক্রমণ করতে এল, তখন সে পালিয়ে গিয়ে নিল সিংহের আশ্রয়।

সিংহের খাদ্যাভাব। ধূর্ত খরগোস অপূর্ব কৌশল খাটিয়ে বোকা জন্তুদের একেবারে সিংহের মুখে এনে দিল, এক অতি সতর্ক বাঁদর এবং তার শিশু ছাড়া আর কেউই প্রায় রক্ষা পেল না। কিন্তু এর পর থেকেই সবাই সাবধান হয়ে গেল, সিংহের আর খাবার জোটে না। সুতরাং নিরুপায় হয়ে সিংহ খরগোসকেই গ্রাস করবার উপক্রম করল।

খরগোস পালিয়ে প্রাণ বাঁচাল কিন্তু প্রতিজ্ঞা করল বিশ্বাসঘাতক সিংহকে সে জব্দ করবে। একদিন সে ঘুমন্ত সিংহের ল্যাজটি বেশ শক্ত করে কাঠের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে দিল। সেই ল্যাজের বাঁধন আর খুলতে পারল না সিংহ—খরগোসকে অনেক স্তুতি-মিনতি করেও লাভ হলো না। শেষে ক্ষুধার জ্বালায় সিংহ মরে গেল।

তখন খরগোস সেই সিংহের চামড়া গায়ে পড়ল। তাকে দেখে সমস্ত প্রাণীজগৎ

[১] Fairly Stories from Africa—Retold by Florence A. Tapsell.

যেমন আশ্চর্য হলো, ভয়ও পেল তেমনি। খরগোস পরমানন্দে সকলকে বোকা বানিয়ে বেড়াতে লাগল।

কিন্তু এবারেও শেষরক্ষা করতে পারল না—নিজের ভুলেই ধরা পড়ল একদিন। তখন সব জন্তুরা তাকে তাড়া করল—সে পালিয়ে গিয়ে মানুষের বসতির কাছে বাসা বাঁধল। আর মানুষের কাছে সব চালাকিই বৃথা। সেখানেই শিকারীর হাতে একদিন লীলাখেলা তার শেষ হয়ে গেল—'and so ended the life of artful hare।'

খুব সংক্ষেপে বিস্তৃত কাহিনীটিকে এখানে বর্ণনা করেছি, কিন্তু ধূর্ততার একটি চূড়ান্ত নমুনা এতে পাওয়া যাবে এবং এ শিক্ষাও পাওয়া যাবে যে অন্যায় ও অসত্যের চতুরতা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হতে বাধ্য।

তার চেয়েও উল্লেখযোগ্য, এর মধ্যে 'পঞ্চতন্ত্রে'র দুটি গল্পের অঙ্কুর পাওয়া যায়। প্রথমটি মন্দমতি (ভাসুরক) সিংহের গল্প—যে মদোন্মত্ত হয়ে শশকের দ্বারা 'নিপাতিত' এবং দ্বিতীয়টি সিংহ-চর্মাবৃত গর্দভের কাহিনী। দক্ষিণাপথের মহিলারোপ্যনিবাসী ব্রাহ্মণ বিষ্ণুশর্মার আফ্রিকার লোককাহিনী শোনবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না এবং কঙ্গো-কিলিমঞ্জেরোর মানুষ নিশ্চয়ই সমুদ্র পাড়ি দিয়ে পূর্বঘাটের ছায়ায় কৃষ্ণা নদীর তীরে গল্প শুনতে এসে উপস্থিত হয়নি। এই সাদৃশ্য এসেছে মানবজাতির চিন্তা ও কল্পনার সর্বব্যাপী মৌলিক সাদৃশ্য থেকেই।

এইবার একটি রূপকথার গল্পকেও এইভাবে পরীক্ষা করা যেতে পারে।

সাপ ও রাজকন্যার গল্প[১]

রাজকন্যা একা পথ বেয়ে চলেছে দূর বিদেশে তার কাকার বাড়িতে। নিবিড় বনের মধ্যে তার দেখা হলো বিরাট এক অজগরের সঙ্গে। অজগর বললে, রাজকন্যা, আমাকে দেখে ভয় পেয়ো না। দুর্গম জঙ্গল কেমন করে একা পার হবে তুমি? আমি পথ চিনি, এসো, তোমায় দেখিয়ে দেব।

সরল বিশ্বাসে রাজকন্যা সাপকে সঙ্গে নিল। কিন্তু সাপ ছিল মায়াবী। সে জানত যে রাজকন্যার কাছে যে কোমরবন্ধটি আছে, সেইটি পরলে সে অবিকল রাজকন্যার রূপ ধরতে পারবে।

সুতরাং কৌশলে রাজকন্যাকে ঠকিয়ে কোমরবন্ধটি সে যোগাড় করে নিল। তারপর যখন তারা কাকার খামারবাড়ির (kraal) কাছে গিয়ে পৌঁছুল, তখন সাপ রাজকন্যাকে বাইরে অপেক্ষা করতে বলে নিজেই চলে গেল। ভিতরে আর কোমরবন্ধটি পরে রাজকন্যার রূপ ধরল।

সাপের সুন্দর পোশাক—পরিষ্কার শরীর; আর রাজকন্যা দীর্ঘ পথশ্রমে ধূলিমলিন, তার বেশবাস ছিন্নভিন্ন। সুতরাং সাপ যখন রাগ করে বলল যে সে পথের মধ্যে একটা গরিব ভিখারি মেয়েকে দেখে দয়া করে সঙ্গে নিয়ে এসেছে, আর সেই

[১] Fairly Stories from Africa—Retold by Florence A. Tapsell.

ভিখারি মেয়েই এখন তার দয়ার সুযোগ নিয়ে রাজকন্যা সাজবার চেষ্টা করছে, তখন কাকা সাপের কথাতেই বিশ্বাস করলেন। সাপ রইল রাজকন্যার আদরে, রাজকন্যা দাসী হয়ে পাকা ফসলের খেত পাহারা দিতে লাগল। একটু কাজের ভুল হলেই আর কথা নেই—গালমন্দ, মারধর তার নিত্য বরাদ্দ।

অবশ্য ভাগ্যক্রমে রাজকন্যার কাছে ছিল একটি জাদুর ঝাঁপি—সাপ যার সন্ধান জানত না, সেই ঝাঁপির সাহায্যেই শেষ পর্যন্ত সব ভুলের নিষ্পত্তি হলো—শয়তান সাপ প্রাণ হারালো।

গল্পটির সারাংশ মাত্র উদ্ধৃত করেছি কিন্তু এর ভেতরে সভ্য পৃথিবীর অনেকগুলি রূপকথা এসে উঁকি দিচ্ছে। ফরাসী রূপকথা 'লে ত্রোয়া সিত্রঁ'—অর্থাৎ 'তিন লেবু'র গল্পে সেই নিগ্রো ক্রীতদাসকে মনে আনবে—যে এইভাবে রাজকন্যার ছদ্মবেশ ধরেছিল; আমাদের বাংলা দেশের রাজবধূ 'কাঞ্চনমালা' আর কাঁকন-দাসী 'কাঁকনমালা'র গল্পও সঙ্গে-সঙ্গেই মনে পড়বে; আর মনে পড়বে সেই রাক্ষসীকে—যে রাজপুত্রকে খেতে না পেরে শেষে সুন্দরী রাজকন্যা হয়ে রাজার অন্তঃপুরে ঢুকেছিল। তফাত এই, বনের মানুষ রাক্ষসের খবর জানে না, ও ভীতিটা একান্তই সভ্য জগতের; তাই রাক্ষসী হয়েছে সাপিনী—যে সাপ তার প্রতিদিনের পরম শত্রু—যার সম্পর্কে তার ভয় আর ঘৃণার অন্ত নেই—যে সাপ ওল্ড টেস্টামেন্টে আর ইসলামে সাক্ষাৎ শয়তানের প্রতিমূর্তি, ইবলিশ!

কিংবা জাপানি 'জিভকাটা চড়াই'য়ের কাহিনীটিকেও মনে করা যেতে পারে।

এক বুড়ো-বুড়ির বাড়িতে একটি চড়াই পাখি বাস করত। বুড়ো ভালো মানুষ ছিল, কিন্তু বুড়ি ছিল নিষ্ঠুর এবং লোভী চরিত্রের। একদিন খাবারে মুখ দেয়ার অপরাধে বুড়ি চড়াইকে ধরে তার জিভ কেটে দিল—রক্তাক্ত চড়াই আর্তনাদ করতে করতে বনে উড়ে পালালো।

কিছুকাল পরে বনের ভেতর বুড়োর সঙ্গে চড়াই পাখির দেখা। চড়াই সেখানে বিয়ে করে সুখে ঘরসংসার পেতেছে। বুড়োকে দেখে পাখিটা পরম আদরে তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেল—প্রচুর খাওয়াল দাওয়াল, দু তিনদিন কাছে রাখল, তার আসবার সময় একটা বড় এবং একটা ছোট ঝুড়ি বুড়োকে দিয়ে বললে, যেটা খুশি তুমি বেছে নাও।

নির্লোভ বুড়ো ছোট ঝুড়িটি নিয়েই বাড়ি ফিরল। তাতে সোনাদানা মণি-মুক্তো—কত কী!

বুড়ি রাগ করে বলল, তুমি কী বোকা! বড় ঝুড়িটা আনলে তাতে কত বেশি পাওয়া যেত! আচ্ছা—আমিই যাচ্ছি।

বুড়ি বনে গেল। চড়াই তাকে দেখে খুশি হলো না—বলাই বাহুল্য। চড়াই-গিন্নি তো সামনেই বেরুল না। তবু চড়াই তাকে যথাসম্ভব আদর আপ্যায়ন করল এবং বুড়ির আসবার সময় সেই রকম ছোট-বড় দুটি ঝুড়ি সামনে এনে উপস্থিত করল।

লোভী বুড়ি বড় ঝুড়িটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়েই বাড়ির দিকে রওনা হলো। পথে আর ধৈর্য থাকে না।—খুলেই দেখি না—কী আছে এর ভেতর! তারপর—[১]

আশা করি, গল্পের শেষাংশটুকু বলবার আর প্রয়োজন নেই এবং বাঙালির রূপকথার 'সুখ ও দুখুর' গল্প-এর মধ্যেই আমাদের মনে পড়েছে। কে কার কাছ থেকে ঋণ নিয়েছে—জোর করে সেকথা কে বলতে পারে!

মানব ইতিহাসের একেবারে প্রথম পাতায় আদমের মাটি কোপানো এবং ইভের কাপড় বোনা শেষ হয়ে গেলে সন্ধ্যার অবসরে যে গল্প তারা করত সন্তানদের কাছে, শ্বেত-পীত-কৃষ্ণে দেশে-দেশান্তরে বিভক্ত হয়ে গিয়েও কি যুগ-যুগান্ত পর্যন্ত সেই প্রথম শোনা গল্প তারা মনে রেখেছে? সারা জগতের লোককথার মধ্যে এই আশ্চর্য ভাব-সংযোগ বিশাল গবেষণার বিষয়—ইয়োরোপের কোনো কোনো পণ্ডিত তা করেছেন এবং করেও চলেছেন। আমাদের সে বিস্তৃতিতে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। আমরা মাত্র এই কথাই বলতে পারি, পরিবেশ, জীবনযাত্রা এবং আনন্দ লাভের প্রয়োজনে সব দেশের মানুষই মোটামুটি একভাবে গল্প ভাবতে শিখেছে।

নীতিশিক্ষা আর রূপকথা। উপকরণ প্রায় একই রকম।

গল্পের ভিতরে গল্প আছে। সে হলো সূর্যকে নিয়ে।

সূর্যোদয় নিরাপদ করে মানুষকে। সূর্য উঠলেই নিশাচরেরা বনের অন্তরালে আত্মগোপন করে; যারা দিনের বেলাতেও আতঙ্ক সৃষ্টি করে—তাদের দেখতে পেয়ে মানুষ সতর্ক হয়ে যায়। শীতের জড়তা থেকে এই সূর্যই তাকে পরিত্রাণ করে। হ্রদের জল যখন জমে যায়, তখন ক্ষুধিত হ্রদ-মানব (Lake Man) অপেক্ষা করে, কখন সূর্যের দীপ্ত দাহনচ্ছটা সে জল গলিয়ে দিয়ে ভাসিয়ে তুলবে মাছের ঝাঁক; সূর্যের আলোয় শস্য তেজ পাবে, ফলের বুক গাঢ় সুমিষ্ট রসে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে।

সূর্য

প্রাচীন মানুষ সূর্যের গল্প বলতে ভালোবাসে। সূর্যের মহিমায় সে মুগ্ধ, চিরকৃতজ্ঞ। পরবর্তীকালে ভারতের ঋষিকবির কল্পনায় এই সূর্যই হয়ে দাঁড়িয়েছেন সত্যের আবরণ, 'ঈশোপনিষৎ' বলছে :

'হিরণ্ময়েনঃ পাত্রেণ সত্যসাপিহিতং মুখম্
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে।।' (১৫)

হিরণ্ময় পাত্রের দ্বারা সত্যের মুখ আচ্ছন্ন আছে; হে সূর্য, সেই সত্যকে পরিদৃষ্ট করবার জন্য সে আবরণ অপাবৃত করো।

মানুষের পরম জ্ঞানসত্তার প্রতীক হয়েছেন সূর্য : 'আদিত্যবর্ণং তমসো পরস্তাৎ'। এই জ্যোতির্ময় রূপকে অবগত হয়েই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়—অন্য পন্থা বিদ্যমান নেই। এই সবিতৃমণ্ডল অধিষ্ঠিত নারায়ণই সদা ধ্যেয়। এই সূর্যের

[১] অনুরূপ আর একটি জাপানি গল্পে এক ধীবর সমুদ্রের অতলে ড্রাগন রাজের কাছ থেকে এই রকম দুটি ঝুড়ি পেয়েছিল।

কাছেই মানুষের প্রার্থনা : 'সমূহ তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি।'[১]

কিন্তু কবি-কল্পনা ও দার্শনিকতার পর্বে পৌঁছানোর আগে সূর্য মানুষের কাছে দেখা দিয়েছেন লৌকিক প্রয়োজনে, তার জীবন-ধাতা রূপে, তার পরম দেবতারূপে।

একটি লৌকিক গল্পই স্মরণ করা যাক।[২]

'সুন্দরী মেয়েটি বলল, আমি সূর্যের কন্যা। তাঁর আদেশ ছাড়া তোমাকে তো আমি বিয়ে করতে পারি না। তুমি সূর্যের অনুমতি নিয়ে এসো।[৩]

সূর্যের কাছে যেতে হবে তাকে সমুদ্র পেরিয়ে। এগিয়ে এল একটি শ্বেত হংস—তার ডানায় চেপে ছেলেটি সমুদ্র পার হয়ে সূর্যদেবের দেশে গিয়ে পৌঁছুল।

শ্বেত হংস বলল, 'সামনে তোমার অনেক প্রলোভন আসবে। গাছে গাছে দেখবে সুমধুর স্বর্গীয় ফল, ইতস্তত কত লোভনীয় সুখাদ্য, পথে পথে দেখবে মণিমাণিক্য ছড়ানো। সাবধান, কিছু স্পর্শ কোরো না। তুমি সব লোভ জয় করে এগিয়ে যাও সূর্যের কাছে, প্রার্থনা করো তাঁর বর, তারপর—'

তারপর যা স্বাভাবিক তাই ঘটেছিল। গল্পের কথক তাঁর শিশু শ্রোতাদের বঞ্চিত করেন নি।

একদিকে হিংস্র শক্তির উপরে জয়, অন্যদিকে কল্যাণশক্তির কাছে বরাভয়। নিজের শক্তি, বুদ্ধি এবং কৌশলের সহায়তা সত্ত্বেও প্রাচীন মানুষের প্রকৃতি সম্বন্ধে ভয়-বিস্ময়-শ্রদ্ধা-কৌতূহলের অন্ত ছিল না। (এইভাবেই দেবতাদের জন্ম হয়েছে।) তাই প্রকৃতির মধ্যে একদিকে যেমন সে তার পরম শত্রুকে—অন্যদিকে পেয়েছে তার ঐকান্তিক বান্ধবকেও। জীব-জগতের হিংসক বিরাট প্রাণীদের কাছ থেকে ক্ষুদ্রদের আত্মরক্ষার প্রয়াস তাকে অভিজ্ঞ এবং সহানুভূতিশীল করে তুলেছে।

আদিম মানুষের দুর্ভাগ্যের অন্ত ছিল না। সেদিন আকাশের বজ্র তার কাছে ছিল অমোঘ, অরণ্যের দাবানল তার চারদিকে বেষ্টনী রচনা করত মৃত্যুবলয়ের মতো, সমুদ্র থেকে ছুটে আসত টাইডাল্ ওয়েভ—পাহাড়ের উপর থেকে যে-কোনো সময় প্রলয়ঙ্কর আভালাঁশ নেমে এসে সগোষ্ঠী তার সমাধি রচনা করে দিতে পারত। তাই তার উৎকল্পনায় হঠাৎ পাহাড়ের প্রাচীর ফাঁক হয়ে গিয়ে তাকে তার মধ্যে আশ্রয় দিত—গাছের ডাল মানুষের ভাষায় আসন্ন বিপদের পূর্বসংকেত তার কাছে ঘোষণা করত। আর সূর্য ছিল তার মহত্তম বন্ধু, তার উদারতম আশ্রয়। আবার বন্য জন্তুদের মধ্যে একদল হিংস্র প্রাণী যেমন ছিল তার পরম শত্রু, তেমনি আর একদল ছিল তার একান্ত সহায়ক, তার বন্ধু। প্রকৃতির এই অনুকূল এবং

[১] পুষন্নেকর্ষে যমসূর্য প্রাজাপাত্য ব্যূহ রশ্মীন্। সমূহ তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি। যোহসাবসৌ পুরুষ সোহহমস্মি। (ঈশ. ১, ১৬)

[২] রেড ইন্ডিয়ান গল্প।

[৩] মহাভারতের সম্বরণ-তপতীর আখ্যান স্মরণীয়। আমাদের হিন্দু শাস্ত্রেও বলা হয়েছে, অনূঢ়া কন্যা সূর্যের দ্বারা সংরক্ষিত—তাই বিবাহ অনুষ্ঠানে সূর্যার্ঘ্য দিয়ে কন্যাকে গ্রহণ করতে হয়।

প্রতিকূল শক্তিকে নিয়ে আদিম মানুষ অসংখ্য গল্প রচনা করেছে। এই কারণে আমাদের বাংলা সাহিত্যই শত্রু বাঘ এবং বন্ধু শেয়ালের গল্পের এমন প্রাচুর্য; তাই শত্রু নেকড়ে যখন প্রিয় পরিচিত শুয়োরছানার কৌশলে ফুটন্ত জলভরা কড়াইয়ের মধ্যে প্রাণ হারায় তখন ইয়োরোপের শিশুরা এতে বেশি খুশি হয়ে ওঠে।

প্রকৃতির এই দ্বিমুখী শক্তির নিদর্শন স্বরূপ একটি গল্পকে গ্রহণ করা যাক :[১]

'পাহাড়ের অনেক—অনেক উপরে, যেখানে কেবল রাশি রাশি তুষার, যেখানে প্রকৃতি যেন রুদ্ররূপে ভ্রুকুটি করে আছে, এতটুকুও প্রাণের স্পন্দন নেই, সেখানেই থাকে তুষাররাজ্যের রাজা। তারও দেহ যেন তুষারের পাহাড়, আর স্বভাবেও সে যেমন নিষ্ঠুর, তেমনি ভয়ঙ্কর। বছরের একটি দিনে মহা সমারোহে তার পুজো—সেদিন প্রকাণ্ড শ্বেত ভালুক আর দুর্দান্ত নেকড়ে বাঘ থেকে আরম্ভ করে, হরিণ-খরগোস-পাহাড়ি ছাগল সবাই তাকে পুজো দিতে যায়।

পুজো শেষ হওয়ার পরে—রাত্রি ভোর হওয়া পর্যন্ত, তুষারের রাজা অপেক্ষা করে। তারপরে যেই আসে শেষ প্রহরে, অমনি সে ধরে তার সংহারমূর্তি। তখন তার সামনে কারোরই আর পরিত্রাণ নেই। ঘর-পালানো দুষ্টু ছেলেটি সে-কথা ভুলে গিয়েছিল। সে লক্ষ্য করেনি, রাত্রের অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে, পাহাড়ি বনের পাতায় পাতায় ভোরের হাওয়া শিরশিরিয়ে বলছে : সাবধান—সাবধান!

টের পেয়েছিল বল্‌গা-হরিণ, তার বন্ধু—যে তাকে পিঠে করে নিয়ে গিয়েছিল রাক্ষস রাজার পূজাপ্রাঙ্গণে। সে কানে কানে বলল, পালাও—আর সময় নেই!

চোখের পলকে ছেলেটি উঠে বসল বল্‌গা-হরিণের উপর। তুষারস্তূপকে দ্রুতগামী চলার পথে পেঁজা তুলোর মতো উড়িয়ে দিয়ে পিছল পাথরের উপর ক্ষুরের শব্দ বাজিয়ে তীরের মতো উড়ে চলল হরিণ। আর ঠিক তখনই পেছন থেকে ভেসে এল পাহাড়-ফাটানো, আকাশ-কাঁপানো এক পৈশাচিক গর্জন। যেমন করে সর্বনাশের রূপ ধরে আভালাঁশ গড়িয়ে আসে, দেখা গেল তুষাররাজ্যের রাজা সেই মৃত্যুদানব তেমনি ঝড়ের বেগে ছুটে আসছে তাদের ধরতে—তার সঙ্গে আসছে ক্ষুধার্ত নেকড়ে আর ভালুকের দল'—

ছেলেটি অবশ্য শেষ পর্যন্ত রক্ষা পেয়েছিল সূর্যের দয়ায়, গলে জল হয়েছিল রাক্ষস-দেবতা। কিন্তু এই কাহিনীটির মধ্যে আদিম গল্পের সমস্ত সূত্রগুলিই যেন পাওয়া যাচ্ছে। তুষারদানব এখানে নির্মম প্রকৃতির প্রতীক, ভালুক আর নেকড়েরা প্রকৃতির বিরোধী শক্তির দল; দ্রুতগামী বল্‌গা-হরিণ মানুষের পলায়নের সহায়তা আর সূর্যের আলো তার পরমতম রক্ষাকবচ। ভারতীয় শাস্ত্রে যিনি ব্রহ্মস্বরূপ, কঠোপনিষদে যাঁকে বলা হয়েছে 'প্রাণেন সম্ভবত্যদিতির্দেবতাময়ী'—তার সম্পর্কে প্রাথমিক প্রেরণা এসেছিল এই কৃতজ্ঞতাবোধ থেকেই।

আর রূপকথার রাজপুত্র কি সূর্যেরই প্রতীক রূপ?

[১] এসকিমো গল্প।

গ্রিক পুরাণের গল্প সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে এ সম্বন্ধে চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন জর্জ কক্‌স। তাঁর বক্তব্য এখানে উদ্ধৃতি-যোগ্য :

'Thus grew up a multitude of expressions which described sun as the child of the night, as the destroyer of darkness, as the lover of the dawn and the dew—of phrases which would go on to speak of him as killing the dew with his spears, and of forsaking the dawn as he rose in the heaven. The feeling that the fruits of the earth were called forth by his warmth, would find utterances in words which spoke be across cloudless skies or amid alternations of storm and calm; his light might break fitfully through the clouds or be hidden for many a weary hour.'[১]

তিমিরান্তক বিঘ্নবিনাশী এই সূর্য তাঁর কল্যাণস্পর্শে মানুষকে ধন্য করেছেন—কৃতার্থ করেছেন। তাই সূর্যকে আশ্রয় করে মানুষের রূপককল্পনা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। এ একেবারে রূপকথার রাজপুত্রের আদিমূর্তি :

'He would thus be described as facing many dangers and many enemies, none of however, may arrest his course; as sullen or capricious, or resentful; as grieving for the loss of the dawn whom he had loved, or as nursing his great wrath and vowing a pitiless vengence. Then as the veil was rent at eventide, they would speak of the chief, who had long remained still, grinding, on his armour; or of the wanderer throwing off his disguise and seizing his bow or spear to smite his enemies; of the invincible warrior whose face gleams with the flush of victory when the fight is over as he greets the fairhaired Dawn who closes as she had begun the day. To the wealth of images thus lavished on the daily life and death of the sun there would be no limit.'[২]

এই সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করেই কক্‌স দেখিয়েছেন, গ্রিক-পুরাণের বহু গল্পই সূর্য, মেঘ, শিশির আর অন্ধকারের প্রতীক কাহিনী। দাফ্‌নের (Daphne) কাহিনী সংক্ষেপে স্মরণ করা যাক। সূর্যের নিরাশ-প্রণয়ের একটি বৃত্তান্ত এটি :

অলিম্পাস্ পর্বতের নিচে শ্যামল উপত্যকা দিয়ে যেখানে পিনিয়স নদী কলধ্বনি তুলে বয়ে যায় সমুদ্রে, সেইখানে থাকে পরমাসুন্দরী পিনিয়স-কন্যা কুমারী দাফ্‌নে। মানুষের সঙ্গ, প্রেম, কিছুই তার কাম্য নয়,—নিজের আনন্দেই সে মগ্ন।

একদিন পাহাড়ের নিচে দাঁড়িয়ে দাফ্‌নে যখন সূর্যোদয় দেখছে, তখন তার সামনে আবির্ভূত হলো এক অপূর্ব মূর্তি। সূর্যের দ্যুতিতে ঝলমল করছে তার দীপ্ত

[১] Tales of Ancient Greece, George W. Cox. Introduction; P. 3

[২] Ibid; P. 4